রোহিঙ্গা সংকট না সম্ভাবনা? রিফ্যুজি ও মানবাধিকার বিষয়ে আগামবেনের চিন্তার পর্যালোচনা

পারভেজ আলম

এক.

রোহিঙ্গা সংকটের সাথে বাংলাদেশের পরিচয় নতুন নয়। যদিও রোহিঙ্গা সংকট বর্তমানে একটি আন্তর্জাতিক সংকট হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশকেই এই সংকট সবচেয়ে বেশি মোকাবেলা করতে হচ্ছে। কারণ রোহিঙ্গাদের বসবাস মিয়ানমার রাষ্ট্রের এলাকায় হলেও তারা মিয়ানমারের সরকার স্বীকৃত ১৩৫টি জাতির অন্তর্ভুক্ত নয়, বরং তাদের বয়ানে রোহিঙ্গারা মিয়ানমারে বসবাসকারী 'অবৈধ বাংলাদেশি অভিবাসী'। মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী ও সাম্প্রদায়িক বৌদ্ধদের নির্যাতন থেকে বাঁচতে ভিটামাটি ত্যাগ করা রোহিঙ্গাদের আশ্রয়স্থলও বাংলাদেশ। কিন্তু রোহিঙ্গারা মিয়ানমার বা বাংলাদেশ–কোনো দেশেরই নাগরিক নয়। নিজ দেশে তারা রাষ্ট্রহীন, পরদেশে রিফ্যুজি। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তাই তাদের মানুষ পরিচয়টাকেই সবচেয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়। বিশ্বজুড়ে অধিকাংশ রাষ্ট্র তাদের মানবাধিকার ক্ষুণ্ন হওয়ার এবং তা রক্ষা করার দাবি তোলে। এই সংকট জারি আছে চার দশকেরও বেশি সময় ধরে। রোহিঙ্গারা রিফ্যুজি হিসেবে বাংলাদেশে আগেও এসেছে। অনেকেই ফেরত গেছে। তা-ও সাম্প্রতিক সংকটের আগে থেকেই বাংলাদেশে প্রায় আড়াই লাখ রোহিঙ্গা রিফ্যুজির অস্তিত্ব ছিল। আর সর্বশেষ মিয়ানমার সামরিক বাহিনীর হত্যা-নির্যাতন থেকে বাঁচতে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে সাড়ে ছয় লাখ রোহিঙ্গা। সরকারি নিবন্ধনের হিসাবে বাংলাদেশে এই মুহূর্তে ৯ লাখ রোহিঙ্গা অবস্থান করছে। রোহিঙ্গা সংকটের সাথে বাংলাদেশের পরিচয় নতুন না হলেও মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের ওপর সাম্প্রতিকতম গণহত্যা ও নির্যাতন এবং বাংলাদেশের প্রায় এক মিলিয়ন রোহিঙ্গা রিফ্যুজির অবস্থান কেন্দ্র করে বাংলাদেশের মানুষকে এখন অনেক নতুন প্রশ্নের মোকাবেলা করতে হচ্ছে। আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতায় বড় ধরনের পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এসব প্রশ্ন ও পরিবর্তন বিশেষভাবে বাংলাদেশের হলেও এদের সার্বিকতা উপলব্ধি না করা গেলে, আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় না নিলে সাম্প্রতিক সংকটের মোকাবেলা আমরা করতে পারব না।

রোহিঙ্গা সংকট শুধু আরাকানে বসবাসকারী একটি গোষ্ঠীর মানবাধিকারের সংকট, নাকি আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের স্বভাবজাত একটি সংকট, সেই প্রশ্নের মোকাবেলা করা জরুরি। বাংলাদেশ ও মিয়ানমার–উভয়েই আধুনিক জাতিরাষ্ট্র। আধুনিক রাষ্ট্রের সীমানা টানার আগে থেকেই রোহিঙ্গারা আরাকানে ছিল, রাখাইনরা ছিল চট্টগ্রামে। প্রাক-আধুনিক কালে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের সীমান্তবর্তী মানুষেরা আরাকান থেকে চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম থেকে আরাকানের এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে হিজরত করেছে। কখনো জীবনের কারণে, কখনো জীবিকার কারণে। মানুষ একটি মোহাজের প্রাণী। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের কাছে এখনো তাদের দেশ হলো বরিশাল, নোয়াখালী, বিক্রমপুর ইত্যাদি। বাংলাদেশের মধ্যেই তারা জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে নিজ দেশ থেকে পরদেশে ক্রমাগত হিজরত করে। বাংলাদেশের বাইরেও করে। মিয়ানমার ও আসামে বহুকাল আগে থেকেই করে আসছে। মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের মতোই আসামের বাংলাভাষী মুসলমানরা এই মুহূর্তে 'অবৈধ বাংলাদেশি অভিবাসী'তে পরিণত হওয়ার আশঙ্কায় আছে। ধারণা করা হচ্ছে, প্রায় ২০ লাখ বাংলাভাষী মুসলমান নাগরিকত্ব হারিয়ে নতুন 'রোহিঙ্গা'য় পরিণত হতে পারে। ভারতে 'বাংলাদেশি খেদাও' একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক বুলিতে পরিণত হয়েছে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপির নির্বাচনী প্রচারণার সময় থেকেই। কিন্তু মোদির ভারতে এখন নাগরিকত্বের তালিকা তৈরি করার নামে যা করা হচ্ছে তা হলো কিছু মানুষকে ভারতের নাগরিকত্ববঞ্চিত করার কর্মযজ্ঞ। উদ্দেশ্য এইখানে ভারত রাষ্ট্রের জমিতে বসবাসকারী সকল মানুষের রাজনৈতিক তথা নাগরিক অধিকার রক্ষা করা নয়, বরং কিছু মানুষের রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নেয়া। তালিকা করে মানুষের নাগরিকত্ব কেড়ে নেয়ার এই রাজনীতির সাথে নাজি জার্মানির তুলনা চলে। অবশ্য কারো কারো, যেমন–ইতালীয় দার্শনিক জর্জিও আগামবেনের মতে, সমাজের সার্বভৌম ইচ্ছার বলি হিসেবে কিছু মানুষের নাগরিকত্ব অথবা রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নেয়াটা 'দেশের সকল জনগণের রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করার নামে তৈরি হওয়া আধুনিক বায়োপলিটিক্যাল জাতিরাষ্ট্রের' স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। নাজি জার্মানি আধুনিক বায়োপলিটিক্যাল রাষ্ট্রের সবচেয়ে কদর্য রূপের উদাহরণ মাত্র, কিন্তু আর দশটা আধুনিক রাষ্ট্রের সাথে তার পার্থক্য অন্তর্গত চরিত্রের দিক থেকে নয়, বরং সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ ও সহিংসতা সংগঠনের মাত্রাগত পার্থক্যের দিক থেকে। এই দাবিকে গুরুত্ব দিয়ে বিচার করার দরকার আছে।

মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের মতোই আসামের বাংলাভাষী মুসলমানরা এই মুহূর্তে 'অবৈধ বাংলাদেশি অভিবাসী'তে পরিণত হওয়ার আশঙ্কায় আছে। ধারণা করা হচ্ছে, প্রায় ২০ লাখ বাংলাভাষী মুসলমান নাগরিকত্ব হারিয়ে নতুন 'রোহিঙ্গা'য় পরিণত হতে পারে। ভারতে 'বাংলাদেশি খেদাও' একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক বুলিতে পরিণত হয়েছে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বিজেপির নির্বাচনী প্রচারণার সময় থেকেই।

ভুলে গেলে চলবে না যে, নাজি জার্মানিতে ইহুদি, জিপসি ইত্যাদি জনগোষ্ঠীকে শুরুতে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করে এবং সব শেষে তাদের নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়েই তাদেরকে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১৯৩৫ সালে জারি করা ন্যুরেমবার্গ আইনের মাধ্যমে জার্মানির উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নেয়ার মধ্য দিয়ে যার সূত্রপাত।[১] রাজনৈতিক তথা নাগরিক অধিকারসম্পন্ন একজন মানুষকে তো আর কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানো যায় না। জর্জিও আগামবেনের মতে, একজন মানুষের যদি রাজনৈতিক অধিকার না থাকে তাহলে সে যথার্থই প্রাচীন রোমান আইনে উল্লেখিত 'পবিত্র মানুষে' (হোমো সেকের) পরিণত হয়, যাকে বহিষ্কার অথবা হত্যা করা যায়। রাজনৈতিক অধিকারহীন মানুষের মানবাধিকারের ধারণাকে তাই আগামবেন প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। এই প্রশ্ন আমাদের জন্যও

গুরুত্বপূর্ণ। সেই সাথে রিফ্যুজি ক্যাম্পের আবির্ভাবকে আগামবেন দেখেন কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের আবির্ভাবের পূর্বাভাস হিসেবে। তাঁর দাবি, ইউরোপের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পগুলো ছিল রিফ্যুজি ক্যাম্পেরই বিবর্তিত রূপ।[২] তাঁর এই দাবির সাথেও আমাদের মোকাবেলা জরুরি।

দুই.

রাজনৈতিক অধিকারবঞ্চিত মানুষের আদৌ কোনো মানবাধিকার থাকে কি না, এই প্রশ্নটি প্রথম যিনি গুরুত্বের সাথে তুলেছিলেন তিনি জার্মান দার্শনিক হান্না আরেন্ট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইহুদি হওয়ার কারণে যে জার্মান বুদ্ধিজীবীরা দেশত্যাগ করে রিফ্যুজি হতে বাধ্য হয়েছিলেন আরেন্ট তার মধ্যে একজন। কিন্তু রিফ্যুজির মানবাধিকার আর রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নিয়ে তাঁর মতো করে তখন আর কেউ প্রশ্ন তোলেননি। আরেন্টের দাবি ছিল, কারো মানবাধিকার কেড়ে নেয়ার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হলো তার রাজনৈতিক মত প্রকাশ ও রাজনৈতিক কর্মসূচির অধিকার কেড়ে নেয়া। অর্থাৎ মানবাধিকার হরণের পূর্বশর্ত হলো রাজনৈতিক অধিকার হরণ। আরেন্টের মতে, রাজনৈতিক অধিকারবঞ্চিত রিফ্যুজিদের 'অধিকার চাওয়ার অধিকার'ই নেই। আর 'অধিকার চাওয়ার অধিকারে'র জন্য তাদেরকে আগে কোনো না কোনো রাজনৈতিক সমাজের (যেমন–রাষ্ট্র) অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।[৩] আরেন্ট এই দাবি করেছেন ১৯৫১ সালে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত 'দি অরিজিনস অব টোটালিটারিয়ানিজম' নামক পুস্তকে। একবিংশ শতকের মানবাধিকার আইনের প্রচার ও রক্ষার স্বার্থে যাঁরা যুক্ত তাঁরা অবশ্য দাবি করতে পারেন (অনেকে করেনও বটে) যে, আরেন্টের এই বিশ্লেষণ তাঁর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতাজাত, এবং এর পরে দুনিয়ায় অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। তাঁদের দাবি, রাষ্ট্রহীন অথবা দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হওয়া মানুষের মানবাধিকার রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার রেজিম এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। কিন্তু রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর কথা বিবেচনায় নিলে আরেন্টের দাবিটি যে এখনো কত যথার্থ তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

রোহিঙ্গাদের অন্তর্ভুক্ত করার বদলে বাংলাদেশে একদল লোক বৌদ্ধদেরকে বহির্ভূত করার উস্কানি দিচ্ছে। হতে পারে এই ধরনের উস্কানিদাতারা নিজেদের জাতীয়তাবাদী বলে না, অথবা ইসলামিস্ট দাবি করে থাকে। কিন্তু ইসলামিস্টরাও আধুনিক। উম্মাহ নামক একটি আরবি শব্দকে (যার অর্থ সমাজ, গোত্র, জাতি ইত্যাদি হতে পারে, তবে আধুনিক যুগে একেবারেই আধুনিক জাতি হিসেবেও এর ব্যবহার দেখা যায়) আধুনিক ইসলামিস্টরা একটি আধুনিক কাল্পনিক 'মুসলিম জাতি'র ধারণায় পর্যবসিত করেছে, যা মূলত ইউরোপের উগ্র জাতীয়তাবাদীদের জাতির ধারণা থেকেই ধার করা।

আগামবেনও রিফ্যুজি প্রসঙ্গে আরেন্টের আলোচনাকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কারণ আগামবেনের রাজনৈতিক চিন্তা রাজনৈতিক জীবন ও মানুষের (জীব হিসেবে) জীবনের পার্থক্যকরণের প্রক্রিয়া ও তার ইতিহাসের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁর মতে, পশ্চিমা রাজনৈতিক দর্শনের গোড়াতেই আছে মানুষের জীবনকে রাজনৈতিক জীবন (bios) আর জীবের জীবন (zoe)–এ দুই ভাগে বিভক্ত করা, অ্যারিস্টোটলের দর্শন যার প্রমাণ। জীবের জীবন হলো ঘরের বিষয়, প্রজনন ও লালন-পালন যার অন্তর্ভুক্ত। আর রাজনৈতিক জীবন হলো নগরের (নগর রাষ্ট্র, polis) বিষয়। নগর তথা পলিসের সাথে যুক্ত এই জীবনের কর্মকাণ্ডই পলিটিকস। প্রাচীন গ্রিস ও রোমে রাজনৈতিক জীবন ছিল শুধুমাত্র পরিবারের কর্তা স্বাধীন পুরুষদের, নারীর জীবন ছিল ঘরের জীবন তথা রাজনৈতিক জীবন না, দাসের জীবনও না। অর্থাৎ মানুষের জীবনকে রাজনৈতিক ও জীবের জীবনের পার্থক্য করার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেমন কিছু মানুষের রাজনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করা হয়, তেমনি কিছু মানুষের রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নিয়ে তাকে নেহাত জীবে পরিণত করারও রাস্তা প্রশস্ত হয়। এই পর্যন্ত আগামবেনের চিন্তার সাথে আরেন্টের চিন্তার পার্থক্য তেমন নেই। উভয়েই একমত যে শুধুমাত্র মানুষ হওয়ার মধ্যে মানবাধিকারের নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু রাজনৈতিক সমাজের (বর্তমানে যে সমস্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব আছে, যেমন–রাষ্ট্র) অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মাধ্যমেই এই সংকট মোকাবেলা করা সম্ভব বলে আরেন্ট যে মত দিয়েছেন, আগামবেন তার সাথে একমত নন। তিনি বরং নতুন রাজনৈতিক সমাজের সম্ভাবনার প্রতি দিকনির্দেশ করেন। কারণ, তাঁর মতে আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের স্বভাবের মধ্যেই আছে বায়োপলিটিকস, অর্থাৎ আধুনিক রাষ্ট্রে খোদ জীবের জীবনই রাষ্ট্রের সার্বভৌম ইচ্ছার অধীন। আধুনিক রাষ্ট্রের বায়োপলিটিক্যাল চরিত্রের কথা অবশ্য আগামবেন প্রথম বলেননি, এই দাবি প্রথম শক্তভাবে তুলেছেন মিশেল ফুকো। ফুকোর মতে, আগের কালের রাজা বা সম্রাটদের সার্বভৌম ক্ষমতার সাথে আধুনিক রাষ্ট্রের বায়োপলিটিক্যাল ক্ষমতার বড় ধরনের পার্থক্য আছে। আগের কালে যেখানে একজন সার্বভৌমের নিরাপত্তা বা রাজ্য বিস্তারের অজুহাতে সেনাবাহিনী তৈরি করে যুদ্ধ করা হতো, সেখানে আধুনিক যুগে খোদ একটা জাতির নিরাপত্তা ও বিকাশের অজুহাতে একটি পুরো জাতিকে যুদ্ধে নিয়োজিত করা যায়, কোটি কোটি মানুষকে জাতীয়তাবাদে উদ্বেলিত করে জীবন নেয়া ও দেয়ার কাজে নামিয়ে দেয়া যায়। ইউরোপে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যেমনটা দেখা গেছে। বায়োপলিটিক একেবারেই আধুনিক বিষয়, ফুকোর এই মতের সাথে অবশ্য আগামবেন একমত নন। তিনি বরং মনে করেন, 'জীবের জীবন' উৎপাদন করা সার্বভৌমত্বের আদি স্বভাব, তবে আধুনিক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই বায়োপলিটিকসের সর্বোচ্চ বিকাশ ঘটা সম্ভব হয়েছে।

আগামবেনের মতে, জাত বা জাতি জীবের জীবনেরই অপর নাম। এ ক্ষেত্রে তিনি নেশন শব্দের উৎস ন্যাশিও শব্দটির আদি অর্থ যে জন্ম (জীবের জীবন) তা তুলে ধরেছেন।[৪] উল্লেখ্য, বাংলা ভাষায় জাতি/জাত শব্দের অর্থও তা-ই–জন্ম। অর্থাৎ আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের চিন্তা ও কর্মসূচির কেন্দ্রেই রয়েছে জন্ম তথা জীবের জীবন। আগামবেনের ভাষায়, জাতিরাষ্ট্র মানেই হচ্ছে এমন এক রাষ্ট্র, যা জন্ম তথা জীবের জীবনকেই তার সার্বভৌমত্বের ভিত্তি বলে প্রচার করে। আধুনিক বর্ণবাদের উৎসও এই ধরনের জাতীয়তাবাদ। বাংলাদেশে আমরা এখন সাম্প্রদায়িকতা বলে যা বুঝি তার পেছনেও আছে জীবের জীবনকে রাজনৈতিক চিন্তার কেন্দ্রে নিয়ে আসার সমস্যা। এইভাবে জাতি বানাতে গেলে জাতিরাষ্ট্রে বসবাসকারী কিছু জীবনকে জাতির বহির্ভূত ধরে নিতে হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানিতে ইহুদিদের যেমনটা ধরা হয়েছে। এখন মিয়ানমারে যেমন রোহিঙ্গাদের ধরা হচ্ছে। আবার রোহিঙ্গাদের অন্তর্ভুক্ত করার বদলে বাংলাদেশে একদল লোক বৌদ্ধদেরকে বহির্ভূত করার উস্কানি দিচ্ছে। হতে পারে এই ধরনের উস্কানিদাতারা নিজেদের জাতীয়তাবাদী বলে না, অথবা ইসলামিস্ট দাবি করে থাকে। কিন্তু ইসলামিস্টরাও আধুনিক। উম্মাহ নামক একটি আরবি শব্দকে (যার অর্থ সমাজ, গোত্র, জাতি ইত্যাদি হতে পারে, তবে আধুনিক যুগে একেবারেই

আধুনিক জাতি হিসেবেও এর ব্যবহার দেখা যায়) আধুনিক ইসলামিস্টরা একটি আধুনিক কাল্পনিক 'মুসলিম জাতি'র ধারণায় পর্যবসিত করেছে, যা মূলত ইউরোপের উগ্র জাতীয়তাবাদীদের জাতির ধারণা থেকেই ধার করা।

কে কোন ধর্ম বা জাতিতে জন্ম নিয়েছে (অথবা জাতি থেকে বিচ্যুত হয়েছে), তার ওপর ভিত্তি করে মানুষের রাজনৈতিক অধিকার সীমিত করা, হরণ করার যে রাজনীতি তা যখন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় চিন্তা ও চর্চায় কেন্দ্রীয় অবস্থান লাভ করে, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের বিষয়ে পরিণত হয়, তখন একটি রাষ্ট্রের বায়োপলিটিক্যাল চরিত্রটি সবচেয়ে খোলামেলাভাবে উন্মুক্ত হয়। আধুনিক বায়োপলিটিক্যাল রাষ্ট্রের চরিত্র বোঝার জন্য রাজনৈতিক অধিকারহীন ও হত্যাযোগ্য জীবনের (bare life) ডিসকার্সিভ উৎপাদনের এই সামাজিক ভূমিকাটা বিশেষভাবে বিবেচনার দরকার আছে। আগের কালে শুধুমাত্র খলিফা, রাজা, সম্রাট অর্থাৎ সার্বভৌম শাসকদেরই ক্ষমতা ছিল কার জীবন রাজনৈতিক জীবন (political/examined life) আর কার জীবন খালি জীবন (bare life) তা নির্ধারণ করার। আধুনিক যুগে এটা হয়ে গেছে সামাজিক ব্যাপার, গণতান্ত্রিক সমাজের পপুলিস্ট রাজনীতির অংশ। আগের কালের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর না ছিল ম্যাস মিডিয়া, না ছিল তখন মসজিদে মাইক, না ছিল ইন্টারনেট অথবা ফেসবুক। ফলে এখন বহিষ্কার অথবা হত্যাযোগ্য জীবের ক্যাটাগরি যত সহজে ও দক্ষতার সাথে এবং সামাজিক স্বীকৃতির মাধ্যমে উৎপাদন করা সম্ভব, আধুনিক যুগের পূর্বে তা সম্ভব ছিল না। আধুনিক পপুলিস্ট রাজনীতির বুলি এবং আধুনিক রাষ্ট্রের দক্ষতা ব্যবহার করেই নাজি জার্মানিতে মানুষকে বহু ভাগে ভাগ করা হয়েছিল, কিছু মানুষকে ডিসকার্সিভভাবে হত্যাযোগ্য জীবে পরিণত করা হয়েছিল। এদেরই জায়গা হয়েছিল কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের গ্যাসের চুলায়। সেই কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প এখন আরাকানে হাজির, সেই গ্যাসের চুলার আগুনে পুড়ে যায় মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের বাড়ি, বাংলাদেশের হিন্দু অথবা পাহাড়ের আদিবাসীর। মার্ক্সীয় ভাষায় যাকে আইডিওলজি বলা হয়, সেই আইডিওলজি এখন আর শুধু আইডেন্টিটির উৎপাদনই করে না, বরং আইডেন্টিটিকে ভিত্তি দেয়াই তার প্রধান কাজ। এবং অন্যদের ভারতীয় অথবা মুসলমান অথবা বাংলাদেশি আইডেন্টিটি খারিজ করার। কুফরের ধারণা ইসলামি আইডিওলজির জন্য জরুরি হলেও কাউকে কাফির বলাটা আগের কালে খুব প্রচলিত ছিল না। আর এখন অপরকে কাফির বলার মাধ্যমেই মানুষ মুসলমান হয়ে উঠছে।

আগের কালের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর না ছিল ম্যাস মিডিয়া, না ছিল তখন মসজিদে মাইক, না ছিল ইন্টারনেট অথবা ফেসবুক। ফলে এখন বহিষ্কার অথবা হত্যাযোগ্য জীবের ক্যাটাগরি যত সহজে ও দক্ষতার সাথে এবং সামাজিক স্বীকৃতির মাধ্যমে উৎপাদন করা সম্ভব, আধুনিক যুগের পূর্বে তা সম্ভব ছিল না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ইউরোপের মানুষ মানুষকে বিভাগনির্ভর আধুনিক জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত করার বিপদ বুঝতে পেরেছিল। ফলে যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই ঘোষণা দেয়া হলো আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের। ইউরোপে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাতিরাষ্ট্রের বায়োপলিটিক্যাল চরিত্র যে বীভৎস রূপ নিয়ে উন্মোচিত হয়েছিল তার প্রভাবেই মানবাধিকারের ধারণা ও আইনের এক ধরনের বিজয় সংগঠিত হয়েছে। অর্থাৎ জাতিরাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া কিংবা জন্মগত পরিচয় থেকে পাওয়া অধিকারের বাইরেও শুধুমাত্র মানুষ হিসেবেই প্রতিটি মানুষের কিছু অধিকারের ধারণায় ইউরোপের মানুষ ঈমান এনেছে। ভারতীয় উপমহাদেশে এখন একদিকে যেমন রাষ্ট্রের বায়োপলিটিক্যাল চরিত্র কদর্যভাবে উন্মোচিত হয়েছে, তেমনি একই সাথে মানবাধিকারের প্রতি ঈমান আনা অথবা মানবাধিকারের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দেয়া মানুষের সংখ্যাও বেড়েছে (যদিও মানবাধিকারের এই তথাকথিত মুমিনদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশই শুধুমাত্র তাদের রাজনীতির পক্ষের মানুষের অধিকারকেই মানবাধিকার বলে মনে করে থাকেন)। যে শেখ হাসিনার আমলে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বায়োপলিটিক্যাল চরিত্র সবচেয়ে ভয়ংকররূপে প্রকাশিত হয়েছে, সেই শেখ হাসিনাই সম্প্রতি রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে নিজ সমর্থকদের কাছ থেকে 'মানবতার আম্মা' (mother of humanity) খেতাব পেয়েছেন। মানুষের নতুন রাজনৈতিক সমাজ নির্মাণের স্বপ্ন যাঁরা দেখেন, যাঁরা একই সাথে মানুষের অধিকারেও বিশ্বাস রাখেন আবার সমাজের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সম্ভাবনার খোঁজ করেন, তাঁদের জন্য এ এক জটিল পরিস্থিতি। এবং এই জটিল পরিস্থিতির মধ্যেই আমাদের ঈমান ও আমল নির্ধারণ করতে হবে।

তিন.

যে কারণে আগামবেন আধুনিক রাষ্ট্রের মধ্যেই রিফ্যুজি সংকট সমাধানের প্রতি আস্থা রাখেন না, সেই একই কারণেই তিনি এই সংকট সমাধানে মানবাধিকারের ধারণা ও আইনের প্রতিও নিঃসন্দেহ নন। এ ক্ষেত্রে তিনি আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের ঘোষণার (Universal Declaration of Human Rights) দলিলকে সামনে নিয়ে আসেন। যদিও আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের ঘোষণা প্রতিটি মানুষের কিছু অবিচ্ছেদ্য অধিকার (inalienable rights) আছে বলে দাবি করে, কিন্তু সেই অধিকার বাস্তবায়নের অধিকার তুলে দেয় রাষ্ট্রগুলোর হাতেই। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার রেজিমের ক্ষমতা নেই নিজে থেকে মানবাধিকারের আইন প্রয়োগ করার। পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রই এসব মানবাধিকার নিশ্চিত করার নিয়ত করেছে (কিছু ক্ষেত্রে রিজার্ভেশন সহকারে), কিন্তু রাষ্ট্রের নাগরিকদের মানবাধিকার রক্ষা করা বা না করা একান্তই রাষ্ট্রের বিষয়। রাষ্ট্র তার দায়িত্ব পালন না করলে নৈতিক সমালোচনা করা অথবা আপত্তি জানানোর বাইরে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার রেজিমের বিশেষ কিছু করার নেই। আগামবেনের মতে, আধুনিক মানবাধিকারের দৃষ্টিভঙ্গির সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হলো তা রাষ্ট্রের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করতে তো পারেইনি, বরং রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রয়োগের নৈতিক (মানবাধিকারের আইনি) বৈধতা দিয়েছে।[৫] আন্তর্জাতিক মানবাধিকার রেজিমকে এ ক্ষেত্রে ইসলামি শরিয়া, যেমন–সুন্নি আইনের রেজিমের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। যদিও সুন্নি আইনের রেজিমের কোনো ক্ষমতা নেই আইন প্রয়োগ করার, কিন্তু বিভিন্ন বিষয়ে আইনি মতামত ও নৈতিক সমালোচনা জারি রাখার মাধ্যমে একদিকে যেমন তা কিছু নৈতিক ধারণার পক্ষে প্রচার চালায়, আবার তেমনি সেসব নৈতিক ধারণা প্রয়োগ করার জন্য শাসকশ্রেণীর ক্ষমতাকেই বৈধতা জুগিয়ে যায় (সেই শাসকশ্রেণী যেমনই হোক না কেন)। বাংলাদেশের উলেমা সমাজ সাম্প্রতিক সময়ে ঈমানি আন্দোলনের নামে এভাবেই আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ক্ষমতার বৈধতা পোক্ত করেছে। যা হোক, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার রেজিমের এই সীমাবদ্ধতা বা দ্বিচারিতা বিষয়ে আগামবেনের সমালোচনার সাথে একমত পোষণ করি। কিন্তু আগামবেন মনে করেন যে, আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের ধারণা যে মানুষের কথা বলে, সেই মানুষ আসলে আধুনিক যুগে জীবের 'খালি জীবনে'র (bare life) প্রতিনিধিত্ব করে।[৬]

আর এখানেই আগামবেনের চিন্তার সাথে মৌলিক দ্বিমত করার প্রয়োজন বলে মনে করি। এই দ্বিমত দিয়েই লেখাটি শেষ করব। কিন্তু তার আগে রিফ্যুজি নামক চরিত্রের মধ্যে আগামবেন যে শুধু সংকটই দেখেন না, বরং বড় ধরনের সম্ভাবনাও দেখেন, সেই আলোচনা করা দরকার।

আধুনিক রাষ্ট্র অথবা মানবাধিকারের ধারণার মধ্যে রিফ্যুজি সংকটের সমাধান খোঁজার বদলে খোদ রিফ্যুজিদের জীবনই যে আমাদের সামনে ভবিষ্যৎ সমাজ ও রাজনীতির দিকনির্দেশনা দিতে পারে সেই দিকেই আগামবেন দৃষ্টি দিতে বলেন। আগামবেনের রাজনৈতিক প্রকল্প হলো এমন এক মানবজীবনের ধারণা প্রতিষ্ঠা করা, যেই জীবনকে রাজনৈতিক ও জীবের জীবন হিসেবে ভাগ করা যায় না। তিনি এমন এক রাজনৈতিক জীবনের সন্ধান করেন, যে রাজনৈতিক জীবন (bios) তার জীবের জীবন (zoe) থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। জীবনের এই অবিচ্ছেদের এলাকা (zone of indistinction) খোঁজাই আগামবেনের রাজনৈতিক দার্শনিক অনুসন্ধান। এহেন সম্ভাব্য রাজনৈতিক মানুষের সমাজকে তিনি জাতির সমাজ নয়, বরং জনতার সমাজ বলে মনে করেন। তাঁর মতে, একমাত্র রিফ্যুজিরাই আমাদের সময়ে প্রকৃত জনতার প্রতিনিধিত্ব করে (যেহেতু তারা জাতীয় নাগরিকও না, আবার শুধু মানুষের ধারণা দিয়ে তাদের সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টাও বাস্তব বিভিন্ন কারণে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়)। যতদিন পর্যন্ত জাতিরাষ্ট্র ও সার্বভৌমত্বের পতন না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত একমাত্র রিফ্যুজি নামক ক্যাটাগরির মধ্যেই ভবিষ্যতের রাজনৈতিক সমাজের কাঠামো ও সীমাবদ্ধতার দিকনির্দেশনা পাওয়া যাবে বলে তিনি মনে করেন।[৭] রিফ্যুজিদের মধ্যে ভবিষ্যতের জনতা ও জনতার সমাজের রাজনৈতিক রূপ খুঁজে পাওয়ার এই চেষ্টা আগামবেনের অবিচ্ছিন্ন জীবন খোঁজার রাজনৈতিক প্রকল্পের সদিচ্ছার সাথে যুক্ত। কিন্তু তাঁর এই প্রস্তাবকেও আমরা বিনা বিচারে মেনে নিতে পারি না। রিফ্যুজি নামক ক্যাটাগরির মধ্যে ভবিষ্যতের রাজনৈতিক জনতার রূপ খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনার পেছনে এক ধরনের পরমকারণমূলক (teleological) চিন্তাকাঠামো আছে। ঐতিহাসিকভাবে বরং দেখা যায় যে, আধুনিক রিফ্যুজি কিংবা আধুনিক যুগপূর্ব মোহাজেররা বিভিন্ন সময়ে নতুন রাজনৈতিক সমাজ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে একেবারেই বৈপ্লবিকভাবে ভিন্ন সমাজের জন্ম দিয়েছে। ইসলামের নবী মুহাম্মদের মক্কা ত্যাগ করে মদিনায় হিজরত থেকে যেমন গোত্রভিত্তিক সমাজ থেকে বৈপ্লবিকভাবে ভিন্ন সমাজের জন্ম হয়েছিল। একাত্তরে বাংলাদেশের এক কোটি মানুষের ভারতে রিফ্যুজি হওয়ার মধ্যে যেমন স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের সম্ভাবনা লুকিয়ে ছিল, সেই উদাহরণও দেয়া যায়। আলাদা করে ভবিষ্যতের সমাজের প্রসঙ্গ না তুলেও বলা যায় যে, রিফ্যুজি নামক ক্যাটাগরির মধ্যে সব সময়ই নতুন সমাজ ও রাজনীতির নির্দেশনা খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা জারি থাকে।

তাছাড়া রিফ্যুজিদের একক কোনো ক্যাটাগরি হিসেবে বিবেচনা করাও সমস্যাজনক। সকল রিফ্যুজিকে এক পাল্লায় মাপার অর্থ হলো তাদের শ্রেণী, লিঙ্গ, রিফ্যুজি হওয়ার পূর্বেকার সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান ইত্যাদিকে বিবেচনায় না নেয়া। শ্রেণী, লিঙ্গ, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের পার্থক্যের কারণেই রিফ্যুজিরা ঠিক একক কোনো জীবনের ক্যাটাগরির প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। হান্না আরেন্টের মতো একজন উচ্চশিক্ষিত রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীর রিফ্যুজিজীবন রিফ্যুজি হওয়ার পরও যতটা রাজনৈতিক থাকে, সিরিয়ার একজন গৃহবধূ নারীর জীবন হয়তো রিফ্যুজি হওয়ার পূর্বেও অতটা রাজনৈতিক ছিল না। মিয়ানমার থেকে জীবন বাঁচাতে বাংলাদেশে হাজির হওয়া এবং এখনো নিরাপত্তার সংকটে থাকা একজন রোহিঙ্গা নারীর জীবন হয়তো কখনোই তেমন কোনো রাজনৈতিক জীবনে পরিণত হবে না। দীর্ঘকাল রিফ্যুজি এবং রাষ্ট্রহীনের জীবন যাপন করেও ফিলিস্তিনি অথবা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে নতুন রাজনৈতিক সমাজের কোনো আভাস পাওয়া যায়নি। আগামবেন তাঁর 'উই রিফ্যুজি' প্রবন্ধটি লিখেছিলেন নব্বইয়ের দশকে, সেই সময় জেরুজালেম শহরটির ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন–এ দুই রাষ্ট্রের যৌথ রাজধানীতে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনার মধ্যে তিনি ভবিষ্যতের রাজনৈতিক সমাজের সম্ভাবনা দেখেছিলেন। তাঁর চিন্তা হিতাকাঙ্ক্ষী সন্দেহ নেই, কিন্তু বাস্তবতা হলো ফিলিস্তিন সমস্যার এখনো সমাধান হয়নি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। আগামবেন যেই সময়ে তাঁর রিফ্যুজি সংক্রান্ত প্রস্তাব লিখেছেন সেই সময়ে পাশ্চাত্যে উগ্র জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রভাব ছিল না তেমন, ইউরোপের জাতিরাষ্ট্রগুলো একটু একটু করে ইউরোপীয় ইউনিয়নের কাঠামোর মধ্যে বিলীন হওয়া শুরু করেছিল। এখন পরিস্থিতি পাল্টেছে, উগ্র জাতীয়তাবাদ শুধু পাশ্চাত্যেই নয়, সারা পৃথিবীতেই প্রবল প্রতাপে ফেরত এসেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার মতো পপুলিস্ট রাজনীতির জয়জয়কার শোনা যাচ্ছে। এই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি মাথায় রেখেই আমাদের বর্তমান সংকটকে বিবেচনা করতে হবে।

তাছাড়া রিফ্যুজিদের একক কোনো ক্যাটাগরি হিসেবে বিবেচনা করাও সমস্যাজনক। সকল রিফ্যুজিকে এক পাল্লায় মাপার অর্থ হলো তাদের শ্রেণী, লিঙ্গ, রিফ্যুজি হওয়ার পূর্বেকার সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান ইত্যাদিকে বিবেচনায় না নেয়া। শ্রেণী, লিঙ্গ, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের পার্থক্যের কারণেই রিফ্যুজিরা ঠিক একক কোনো জীবনের ক্যাটাগরির প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না।

চার.

আগেই বলেছি, মানবাধিকার ঘোষিত মানুষের ধারণাকে যে আগামবেন আধুনিক দুনিয়ায় 'খালি জীবনে'র (bare life) প্রতিনিধি বলে মনে করেন তার সাথে মৌলিক দ্বিমত পোষণ করা প্রয়োজন মনে করি। আগামবেন সার্বভৌমত্ব ও সার্বভৌম ক্ষমতার হাতে খালি জীবনের উৎপাদনের সিলসিলা লিখতে গিয়ে তাঁর চিন্তার পক্ষে বিভিন্ন উদাহরণ দেয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মানবাধিকার ঘোষিত মানুষের ধারণার পেছনে যে 'মানবিক মর্যাদা'র (human dignity) ধারণা কাজ করেছে, যে মানবিক মর্যাদার প্রতি 'সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা'য় বিনা প্রশ্নে ঈমান আনা হয়েছে, সেই মানবিক মর্যাদার ধারণার সিলসিলা সন্ধান করলে দেখা যাবে যে এই মানুষের ধারণা বরাবরই একটি রাজনৈতিক ধারণা। ধারণাটির একটা ধর্মীয় ইতিহাস আছে, একটা সেক্যুলার ইতিহাস আছে। কিন্তু ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় যে, যুগে যুগে খালি জীবনে পরিণত হতে অস্বীকার করা মানুষের রাজনৈতিক চিন্তা ও তৎপরতার মধ্য দিয়েই মানবিক মর্যাদার ধারণাটি গড়ে উঠেছে। যেমন–কোরান শরিফে আদমকে ফেরেশতাদের সেজদা করার কাহিনী কিংবা সকল প্রাণীর ওপর আদমসন্তানকে আলাহ মর্যাদা দিয়েছেন–এমন কাহিনী পাওয়া যায়। মানুষের এই বিশেষ মর্যাদা ঘোষণার পেছনে মুহাম্মদের মক্কায় নির্যাতিত হওয়ার প্রেক্ষাপট বিবেচনা করতে হবে, এই বিষয়ে অন্যত্র লিখেছি। আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্ক বা দুনিয়ায় মানুষকে আল্লাহর খলিফা দাবি তুলে সকল আদমসন্তান তথা মানুষের জীবনকে আর দশটা জীবের

জীবন থেকে আলাদা করা হয়েছে। ফকির লালন শাহর 'আপন সুরতে আদম গড়লেন সাঁই' গানের মধ্যেও একই ধারণার প্রতিনিধিত্ব পাওয়া যায় (আদমি হলে চিনে আদম, পশু কি তার জানে মরম)। অর্থাৎ অধিকারপূর্ণ মানুষের ধারণা প্রথম থেকেই একটি রাজনৈতিক ধারণা। আধুনিক মানবাধিকার রেজিম মানবাধিকারকে অরাজনৈতিক বলে দাবি করলেই তা অরাজনৈতিক হয়ে যায় না। বরং মানবাধিকারের পেছনকার রাজনীতি, পশুর জীবনে পরিণত না হওয়ার যে সংগ্রাম, তাকে চিহ্নিত করাটাই এই মুহূর্তে দরকার।

আগামবেনের বিশ্লেষণ যেমন মৌলিক, তেমনি বর্তমানে তা আমাদের জন্য দরকারিও বটে। কিন্তু ভবিষ্যতের রাজনীতির জন্য সম্ভাব্য জীবন ও সমাজের যে সমস্ত উদাহরণ তিনি হাজির করেছেন তেমন অনেক উদাহরণকেই প্রশ্নবিদ্ধ করা দরকার বলে মনে করি। সাম্প্রতিক সময়ে তিনি ফ্রান্সিসকান খ্রিস্টানদের (যাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা নেই) জীবনকে উদাহরণ হিসেবে হাজির করেছেন, যাদের সাথে মুসলিম দুনিয়ার দরবেশদের জীবনের বিশেষ মিল আছে। একই সাথে বাইবেলে সাধু পলের উল্লেখ করা 'ঈসার জীবন'কেও তিনি উদাহরণ হিসেবে টেনেছেন, যেহেতু পল ঈসার জীবন লিখতে গিয়ে zoe লিখেছেন, bios লেখেননি। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও সংসারের সকল অধিকার ছেড়ে দেয়া সাধু বা দরবেশদের জীবনে ভবিষ্যতের রাজনৈতিক জীবনের কোনো সম্ভাবনা লুকিয়ে নেই সেই দাবি করছি না। তবে আমাদের বর্তমান সংকট মোকাবেলায় এই সমস্ত জীবনের উদাহরণ কার্যকর কোনো রাজনৈতিক দিশা দিতে পারবে বলে মনে হয় না। তার চেয়ে বরং নব্বইয়ের দশকে প্রকাশিত আগামবেনের সাড়া জাগানো 'হোমো সেকের' বইয়ে উলেখ করা 'খালি জীবনে'র একটি বিবরণ অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক মনে হয়। এই খালি জীবন সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে আগামবেন যা লিখেছিলেন তার ভাবানুবাদ–

> মানুষের ধারণা বরাবরই একটি রাজনৈতিক ধারণা। ধারণাটির একটা ধর্মীয় ইতিহাস আছে, একটা সেক্যুলার ইতিহাস আছে। কিন্তু ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় যে, যুগে যুগে খালি জীবনে পরিণত হতে অস্বীকার করা মানুষের রাজনৈতিক চিন্তা ও তৎপরতার মধ্য দিয়েই মানবিক মর্যাদার ধারণাটি গড়ে উঠেছে।

"তার পুরো অস্তিত্বই খালি জীবনে পরিণত হয়েছে, যেহেতু তার সমস্ত অধিকারই কেড়ে নেয়া হয়েছে এবং তাকে হত্যা করাটা অপরাধ বলে বিবেচনা করা হবে না। তার নিজেকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় হচ্ছে পরদেশে পলায়ন...সে শুধুই একজন পশু, কিন্তু এমন একজন পশু, যার জীবন সার্বভৌমের বহিষ্কারের মধ্যে আটকে গেছে এবং যার মোকাবেলা তাকে প্রতিনিয়ত করতে হবে, ছলে-বলে-কৌশলে। এই দিক থেকে দেখলে, কোনো জীবনই, একজন নির্বাসিত ভালো জানে, তার জীবনের চেয়ে বেশি 'রাজনৈতিক' নয়।"[৮]

আগামবেনের এই বর্ণনা এমন এক খালি জীবনের কথা বলে, যে মোটেই অরাজনৈতিক নয়। এবং এমন জীবনের উল্লেখযোগ্য একটি উদাহরণ হলো ইসলামের নবী মুহাম্মদের জীবন। ঈসা যদি হয় একজন প্যাসিফিস্ট হিপ্পি, মুহাম্মদ তবে একজন বিপ্লবী, যিনি অধিকার হারিয়ে পশু অথবা খোদা–এ দুইয়েই রূপান্তরিত হতে অস্বীকার করেছেন। আবু তালিবের ক্যাম্পে সমাজচ্যুত হয়ে অভাবে দিন কাটিয়েছেন, কষ্ট ভোগ করে তাঁর চাচা মারা গেছেন, প্রিয় স্ত্রী মারা গেছেন। মক্কায় নিরাপত্তাবঞ্চিত হয়ে এখানে-সেখানে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন, আরো নির্যাতিত হয়েছেন। হত্যাযোগ্য জীবে রূপান্তরিত হয়ে শেষে মোহাজের হয়েছেন। কিন্তু অরাজনৈতিক জীবে পরিণত হননি। এই মুহাম্মদ একজন মজলুমের উদাহরণ, যে খালি জীবনে পরিণত হতে অস্বীকার করেছে। উল্লেখ্য, যারা নির্যাতিত মুসলমানদের কথা প্রচার করে আজকাল মানুষকে জিহাদে আকৃষ্ট করার রাজনীতি করে, তাদের রাজনীতিতে এই মজলুম মুহাম্মদকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কিন্তু বাংলাদেশে ইসলামপন্থী এবং জিহাদপন্থীরাই রোহিঙ্গাদের মধ্যে রাজনৈতিক সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছে, এবং তাদের সাথে রাজনৈতিক সম্পর্কও গড়ে তুলেছে। অন্যদিকে বামপন্থীরাও মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলোর মতো রোহিঙ্গাদের মধ্যে রাজনৈতিক সম্ভাবনার বদলে সংকটের দিকেই বেশি নজর দিতে বাধ্য হয়েছে। রোহিঙ্গা প্রসঙ্গে তারা হয় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার প্রসঙ্গ তুলে ধরেছে অথবা রোহিঙ্গাদের পক্ষে মানবাধিকারের ভাষায় কথা বলেছে। ফিলিস্তিনের জনগণের রাজনৈতিক অধিকারের পক্ষে বাংলাদেশের বামপন্থীদের একসময় যে অগ্রগণ্য ভূমিকা ছিল, রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে সেটা দেখা যায়নি। সত্তরের দশক থেকে বিপ্লবী রাজনীতির পতন, পোস্ট ফোর্ডিও বিশ্বব্যবস্থায় নিও লিবারাল অর্থনীতির জয়জয়কারের মধ্যে মানবাধিকারের ভাষাই একমাত্র নৈতিক ভাষা হিসেবে পোক্ত হয়েছে। বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশের রাজনীতিক ও চিন্তকদের মধ্যেও নৈতিক মানদণ্ড হিসেবে মানবাধিকারের ভাষার এক ধরনের বিজয় সংঘটিত হয়েছে। বামপন্থীরাও তার বাইরে নয়। মানবাধিকারের ভাষা প্রয়োগের প্রয়োজন অস্বীকার করছি না, বরং এর প্রয়োজনীয়তার প্রতি জোর দিচ্ছি। কিন্তু মানবাধিকার ঘোষিত মানুষের ধারণার পেছনের সদাসর্বদা বিরাজমান রাজনীতিকে সামনে না আনতে পারলে, মানবাধিকারের ভাষাকে জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের সংগ্রামের বিপ্লবী রাজনীতির বয়ানে যুক্ত না করতে পারলে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার রেজিমের সীমাবদ্ধতা ও দ্বিচারিতার ভাগীদার আমাদেরও হতে হবে। তাতে রোহিঙ্গারা একটি সংকট হিসেবেই বিদ্যমান থাকবে; নতুন কোনো সম্ভাবনার দেখা মিলবে না।

পারভেজ আলম: লেখক, ব্লগার
ইমেইল: stparvez@gmail.com

তথ্যসূত্র

১) Giorgio Agamben, "We Refugees". Symposium; Summer 1995; 49, 2; ProQuest p. 115-117
২) Ibid.p.117
৩) Hannah Arendt. The Origins of Totalitarianism, new edition (San Diego/New York/London: Harcourt, 1968), p.296-297.
৪) Giorgio Agamben, "We Refugees". Symposium; Summer 1995; 49, 2; ProQuest p.117
৫) Daniel McLoughlin.Post-Marxism and the Politics of Human Rights: Lefort, Badiou, Agamben, Rancie`re Daniel McLoughlin. Published online, Springer: 16 March 2016. p.312
৬) পূর্বোক্ত
৭) Giorgio Agamben, "We Refugees". Symposium; Summer 1995; 49, 2; ProQuest p.114.
৮) Giorgio Agamben. Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life. Translated by D. Heller-Roazen. Stanford